# সাম্রাজ্যের সমাপ্তি

আসিফ আদনান

---

অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসছে। মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ আর বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক সামরিক সম্প্রসারণ অ্যামেরিকার অর্থনীতিকে নিঃশেষিত করছে। বাড়তে থাকা ঋণ, ঘাটতি, ডি-ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইযেশান এবং বৈশ্বিক নানা বানিজ্য চুক্তির ভারে অ্যামেরিকার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে। অ্যামেরিকার গনতন্ত্রকে বন্দি ও ধ্বংস করে ফেলেছে - ট্যাক্স মওকুফ, ডি-রেগুলেইশান, এবং ভয়ঙ্কর মাত্রার জোচ্চুরির পর সব ধরণের জবাবদিহিতা থেকে অব্যহতির আবদার করা - আর সরকারি বেইলআউটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার লুট করা বড় বড় কর্পোরেইশানগুলো। ইউরোপ, ল্যাটিন অ্যামেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য যে ন্যূনতম সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়া দরকার, জাতি হিসেবে অ্যামেরিকা অনেক আগেই সেটা হারিয়েছে।

এসব কিছুর সাথে যোগ করুন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘনিয়ে আসা বিপর্যয় - অবশ্যম্ভাবী এক ডিসটোপিয়ার (Dystopia) রেসিপি পাবেন। এ পতনের তদারকি করছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বসে থাকা, মূর্খ, ভন্ড, চোর, সুবিধাবাদী আর যুদ্ধবাজ জেনারেলদের এক বিচিত্র দল। আর স্বচ্ছতার খাতিরে, এখনই বলে দেই, হ্যাঁ, আমি ডেমোক্রেটদের কথাও বলছি।

অ্যামেরিকান সাম্রাজ্য কিছুদিন খুড়িয়ে খুড়িয়ে এগিয়ে যাবে। ক্রমেই প্রভাব কমতে থাকবে। এক পর্যায়ে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো রিযার্ভ কারেন্সি হিসেবে ডলারের ব্যবহার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেবে। আর ঠিক তখনই অ্যামেরিকা এমন এক মারাত্মক, অবশ করে দেওয়া অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হবে, যা তাকে তাৎক্ষনিকভাবে বাধ্য করবে নিজ সামরিক যন্ত্রের আকার কমিয়ে আনতে।

আকস্মিক ও ব্যাপক গণবিদ্রোহ ছাড়া এই মৃত্যুর এই ক্রমেই নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকা, এই সাম্রাজ্যের পতন থামানো অসম্ভব। আর এমন কোন বিদ্রোহ সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ। যার অর্থ হল, সর্বোচ্চ এক থেকে দু' দশকের মধ্যে, আমাদের চেনা অ্যামেরিকার আর অস্তিত্ব থাকবে না।

সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক শূন্যতা পূরণ করবে অতিকায় সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা চীন। অথবা রাশিয়া, চীন, ভারত, ব্রাযিল, তুর্কি, দক্ষিন আফ্রিকা এবং অন্যান্য আরো কিছু রাষ্ট্রকে নিয়ে বহুমেরুর এক বিশ্ব গড়ে উঠবে। কিংবা এ শূন্যতা পূরণ করবে "ডাভোস ও বিল্ডারবার্গ থেকে স্ব-নির্বাচিত অর্থনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে বহুজাতিক কর্পোরেইশান ও ন্যাটোর মতো বহুপাক্ষিক সামরিক জোটকে একত্রিত করে তৈরি করা এমন এক অক্ষ, যা ছাড়িয়ে যাবে যেকোন জাতি, রাষ্ট্র অথবা সাম্রাজ্যকে" – যেমনটা ঐতিহাসিক অ্যালফ্রেড ডাবিউ. ম্যাকয় তার বই "In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of US Global Power" – তে লেখেছেন। [1]

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থেকে শুরু করে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ – সুপারকম্পিউটার, মহাকাশে ব্যবহারের অস্ত্র, এবং সাইবার ওয়ারফেয়ারসহ অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি – সব ক্ষেত্রে, সব সূচকে চাইনিযরা অ্যামেরিকাকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে। ম্যাকয় তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে - "২০১৫ এর এপ্রিলে অ্যামেরিকার কৃষি বিভাগ (Department of Agricuture) মতপ্রকাশ করেছে আগামী ১৫ বছরে অ্যামেরিকার অর্থনীতিতে বৃদ্ধি হবে প্রায় ৫০% এর মতো। অন্যদিকে একই সময়ে চীনের অর্থনীতি বেড়ে বর্তমান অবস্থার তিন গুন হবে, এবং ২০৩০ এর মধ্যে চীন অর্থনীতিতে অ্যামেরিকাকে ছাড়িয়ে যাবার দ্বারপ্রান্তে পৌছে যাবে।" চীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত ২০১০ সালে হয়। একই বছর বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় উৎপাদক রাষ্ট্রের স্থানটাও তারা দখল করে নেয় - যে অবস্থানটা এর আগের একশো বছর ধরে অ্যামেরিকার দখলে ছিল।

অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ (Department of Defense) "At Our Own Peril: DoD Risk Assessment in a Post-Primacy World" নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী অ্যামেরিকার সামরিক বাহিনীর "(বিভিন্ন) রাষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আগের মতো অজেয়, অনাক্রমনীয় অবস্থান আর নেই", এবং "অ্যামেরিকান সামরিক বাহিনী এখন আর আগের মতো নিজ শক্তির কেন্দ্রের বাইরে, সুসংহত এবং টেকসই আঞ্চলিক সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সমর্থ না"।

ম্যাকয়ের ধারণা অ্যমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন আসবে ২০৩০ এর মধ্যে।

ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যগুলো আত্মহননের একগুঁয়ে পথ বেছে নেয়। ঔদ্ধত্য তাদের অন্ধ করে রাখে, নিজেদের কমতে থাকা ক্ষমতার বাস্তবতা তারা স্বীকার করতে পারে না। বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে তারা এমন এক কল্পরাজ্যে আশ্রয় নেয় যেখানে কঠিন ও অপ্রিয় সত্যগুলোর প্রবেশাধিকার থাকে না। গণতন্ত্র, জোটবদ্ধতা এবং রাজনীতিকে তারা প্রতিস্থাপন করে একপাক্ষিক হুমকি আর যুদ্ধের হাতুড়ি দিয়ে।

সামষ্টিক এ আত্মপ্রতারণার কারণেই অ্যামেরিকা ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক স্ট্র্যাটিজিক ভুল করেছিল – ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমণ। বস্তুত এ ভুলই অ্যামেরিকান বিদায়ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে।[2]

বুশ প্রশাসনের সময়কার এ যুদ্ধের স্থপতিদের, এবং মিডিয়া ও অ্যাকাডেমিয়ায় তাদের মূর্খ স্তাবক তোতাপাখিদের এ দেশদুটোর ব্যাপারে বাস্তব ধারণা ছিল খুব কম। এ ধরণের যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা ছিল শিশুসুলভ, এবং এ আক্রমণের ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার কোন রকমের প্রস্তুতি তাদের ছিল না। তারা দাবি করেছিল, সম্ভবত বিশ্বাসও করেছিল সাদ্দাম হোসেইনের কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে, যদিও এ দাবির পক্ষে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না। তারা বলেছিল, বাগদাদে গণতন্ত্র স্থাপিত হবে এবং তারপর তা ছড়িয়ে পড়বে পুরো মধ্য প্রাচ্যে। তারা অ্যামেরিকান জনগণকে আশ্বস্ত করেছিল - ইরাকি ও আফগানরা হাসিমুখে, কৃতজ্ঞচিত্তে অ্যামেরিকান সেনাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে বরণ করে নেবে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ইরাকের তেলের টাকা দিয়েই ইরাক পুনর্গঠন করা সম্ভব হবে। তারা জোরগলায় দাবি করেছিল, দ্রুত ও আগ্রাসী সামরিক আঘাত – শক অ্যান্ড অ' (shock & awe) – মধ্যপ্রাচ্যে অ্যামেরিকান কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্টিত করবে।

বাস্তবতা ছিল তাদের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত।

যেবিগ্নিউ ব্রেযনিস্কির ভাষায় – "ইরাকের বিপক্ষে স্বেচ্ছায় শুরু করা এই একপাক্ষিক যুদ্ধ অ্যামেরিকান বৈদেশিক নীতির অন্যায্যতার ব্যাপারে বিশ্ব জুড়ে অত্যন্ত দ্রুত, অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিল।"

সাম্রাজ্যের অন্তিম পর্যায়ে ঘটা এসব সামরিক কেলেঙ্কারিকে ঐতিহাসিকরা বলেন "মাইক্রো-মিলিটারিযম" (micro-militarism). এথেন্সবাসী মাইক্রো-মিলিটারিযমে লিপ্ত হয়েছিল পেলোপোনেইশান (৪৩১-৪০৪ খ্রিষ্টপূর্ব) যুদ্ধের সময় সিসিলি আক্রমণের মাধ্যমে। এর ফলে তারা হারিয়েছিল ২০০ জাহাজ ও হাজার হাজার সেনা। এ ঘটনা পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করেছিল। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ প্রণালীর জাতীয়করণকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া দ্বন্দ্বের জের ধরে মিশর আক্রমণ করে, ব্রিটেন একইধরনের ভুল করেছিল। আক্রমণের অল্প কিছু দিন পরই অপমানিত ব্রিটেন পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। এ ঘটনার ফলে আরব জুড়ে জামাল আব্দুন-নাসেররের মতো জাতীয়তাবাদী নেতাদের অবস্থান শক্ত হয়েছিল, এবং যে ক'টি অবশিষ্ট উপনিবেশের ওপর তখনো ব্রিটেনের কর্তৃত্ব টিকে ছিল, তারা সেগুলোর নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে ফেললো। এথেন্স বা ব্রিটেন, কেউই এ ভুলগুলোর পর ঘুরে দাড়াতে পারেনি।

ম্যাকয়ের মতে – "সামরিক শক্তি প্রয়োগ, দখলদারিত্ব, ও দূরবর্তী উপনিবেশ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদীয়মান সাম্রাজ্যগুলো বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি ও যৌক্তিক চিন্তার পরিচয় দেয়। অন্যদিকে ম্লান হয়ে আসা পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যগুলোর ঝোঁক থাকে শক্তি প্রদর্শনের হঠকারী পদক্ষেপ আর কাল্পনিক কোন সামরিক মহাকৌশলের মাধ্যমে এক ধাক্কায় হারানো সম্মান ও শক্তি ফিরে পাবার আকাশকুসুম স্বপ্নের দিকে। অধিকাংশ সময়, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান থেকেও অযৌক্তিক এসব মাইক্রো-মিলিটারি অভিযান বা যুদ্ধগুলোর খরচ জোগাতে সাম্রাজ্যের সম্পদ ক্রমেই নিঃশেষিত হতে থাকে। অথবা তারা লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়, যা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া পতনের প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করে।"

অন্যান্য জাতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্তিই যথেষ্ট না। সাম্রাজ্যগুলোর আরও বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় - এক ধরণের মিস্টিক (Mystique) – এর। এমন কিছু যা সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট, শোষণ ও নিপীড়নকে আড়াল করে রাখবে। এমন কোন মুখোশ যা উপনিবেশের বোকা নেটিভ অভিজাতদের সাম্রাজ্যাবাদের জন্য কাজ করতে প্রলুব্ধ করবে, অথবা কমসেকম তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখবে। আর যেসব জনগণ ও সেনাদের পয়সা ও রক্ত দিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে - এই মিস্টিক তাদের সামনে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ওপর সভ্যতা; এমনকি মাহাত্ম্যের একটা আস্তরণ তৈরি করে উপস্থাপন করবে।

কেন্দ্রের আদলে উপনিবেশগুলোতে ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রের আপাত প্রতিষ্ঠা, পোলো, ক্রিকেট আর ঘোড়দৌড়ের মতো বিভিন্ন ব্রিটিশ খেলার আমদানী, জাকজমকপূর্ণ পোশাক পরা রাজপ্রতিনিধি আর মহাসাড়ম্বরে রাজবংশীয়দের প্রদর্শনী – এসব কিছু ছিল ঐ মিস্টিক, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের "অজেয় নেভি ও সামরিক বাহিনীর" পরিপূরক হিসেবে কাজ করতো। ১৮১৫ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ইংল্যান্ড নিজের সাম্রাজ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর তারা বাধ্য হয় বিশ্ব মঞ্চ থেকে নিয়মিত পশ্চাদপসরনে।

গণতন্ত্র, মুক্তি আর সাম্য নিয়ে অ্যামেরিকার গালভরা বুলির পাশাপাশি – বাস্কেটবল, বেইসবল ও হলিউড, অ্যামেরিকার সামরিক বাহিনীকে পূজনীয়, অজেয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় ঐশ্বরিক শক্তি হিসেবে উপস্থাপন – এসব কিছুই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বকে মন্ত্রমুগ্ধ অথবা আতঙ্কিত করে রেখেছিল। কিন্তু পর্দার আড়ালে, অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটেছিল, মার্কিন সমর্থিত অভ্যুত্থান, সাজানো

নির্বাচন, রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, প্রপাগ্যান্ডা ক্যাম্পেইন, ঘুষ, ব্ল্যাকমেইল, হুমকি ও নির্যাতন – এর মতো সিআইএ-এর নানা নোংরা কৌশলের মাধ্যমে।

কিন্তু আজ আর এগুলো কাজ করছে না।

অ্যামেরিকা তার মিস্টিক হারিয়েছে। এ অপূরনীয় ক্ষতি তাকে "প্রায় অক্ষমে" পরিণত করেছে। এর ফলে সাম্রাজ্যের দেখাশোনার জন্য দালাল খুজে পাওয়া কঠিন হয় গেছে। যেমনটা আমরা ইরাক ও আফগানিস্তানে দেখেছি। আবু গ্রাইবে আরব বন্দিদের ওপর চালানো শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের ছবিগুলো মুসলিম বিশ্বে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং আল-ক্বাইদা ও আইএস-এর জন্য জোগাড় করেছে অসংখ্য নতুন সদস্য । মার্কিন নাগরিক আনওয়ার আল-আওলাকি ও ওসামা বিন লাদেনসহ বিভিন্ন জিহাদি নেতাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুপ্তহত্যা অ্যামেরিকার প্রচারিত আইনের শাসনের (Habeas Corpus) পুরো ধারণাকেই উপহাসে পরিণত করেছে, হাস্যস্পদ করে তুলেছে।

লক্ষা লক্ষ মৃতদেহ, অ্যামেরিকার ব্যর্থ সামরিক আগ্রাসনের পরিণতি থেকে পালাতে বেপরোয়া লক্ষ লক্ষ আরব রিফিউজি এবং ড্রোন হামলার প্রায় নিরবচ্ছিন্ন হুমকি - সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে অ্যামেরিকার স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছে। ব্যাপক নৃশংসতা, নির্বিচার সহিংসতা, মিথ্যা এবং প্রতিবন্ধীর মতো হিসেবের গড়মিলের প্রতি যে আসক্তি ভিয়েতনামে অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণ হয়েছিল, মধ্যপ্রাচ্যে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

দেশের বাইরে চালানো এ নৃশংসতারা সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দেশের ভেতরের সহিংসতা। সামরিকায়িত এক পুলিশ বাহিনী নিয়মিত গুলি করে হত্যা করছে নিরস্ত্র, গরীব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের। বৈশ্বিক জনসংখ্যার মাত্র ৫% হবার পরও অ্যামেরিকার কারাগারগুলোতে আবদ্ধ পুরো পৃথিবীর মোট বন্দিদের ২৫%। অ্যামেরিকার অনেক শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। গণপরিবহন ব্যবস্থায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। মার্কিন শিক্ষা ব্যবস্থার মানের অবনতি হচ্ছে, এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাইভেটাইয করা হচ্ছে। অপিঅয়েড আসক্তি , আত্মহত্যা, বন্দুকধারীদের চালানো গণহত্যা, ডিপ্রেশান এবং বীভৎস স্থূলতা আজ প্লেগের মতো জেঁকে বসেছে প্রগাঢ় হতাশার অন্ধকূপে আটকে যাওয়া এক জনগোষ্ঠীর ওপর।

অ্যামেরিকার শাসনব্যবস্থার ওপর ওয়াল স্ট্রিটের নীরব কর্পোরেট অভ্যুত্থান এবং রাষ্ট্রের অর্ধেকেরও বেশি অংশকে ভোগানো দারিদ্র্য - অ্যামেরিকান স্বপ্নের অবাস্তবতার ব্যাপারে অ্যামেরিকানদের মোহমুক্তি ঘটিয়েছে। জন্ম দিয়েছে গভীরে প্রোথিত ক্ষোভের। এ প্রতিক্রিয়া একদিকে ট্রাম্পকে নির্বাচনে বিজয়ী করেছে, অন্যদিকে "অ্যামেরিকা একটি কার্যকরী গণতন্ত্র" – এই মিথ্যে ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছে। অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টের টুইট এবং বক্তব্যগুলো ঘৃণা, বর্ণবাদ, গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ। দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা। এই প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘের অধিবেশনে একটি রাষ্ট্রকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার এবং একটি জাতির ওপর গণহত্যা চালানোর হুমকি দিয়েছে।

অ্যামেরিকা এখন বিশ্বজুড়ে উপহাস ও ঘৃণার পাত্র। অন্ধকার ভবিষ্যত্যের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে একের পর এক ডিস্টোপিয়ান সিনেমাতে, যেগুলো আর অ্যামেরিকার মাহাত্ম্যের কথা বলে না, অ্যামেরিকার বিশেষত্বের কথা বলে না, মানবজাতির উন্নতির মুখস্থ,

মিথ্যে বুলি আওড়ায় না – বরং এক অন্ধকার, হতাশাময় ভবিষ্যতের ছবি আঁকে।

অ্যালফ্রেড ম্যাকয়ের ভাষায় –

"সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে অ্যামেরিকার মৃত্যু আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক দ্রুত হতে পারে। যদিও সাম্রাজ্যগুলোর অসীম শক্তিধর বা অজেয় হবার একটা মায়াজাল ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যগুলো বিস্ময়কর রকমের ভঙ্গুর হয়ে থাকে। একটা সাধারন জাতিরাষ্ট্রের সমান সহজাত শক্তিও তাদের থাকে না। সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যেরও বিভিন্ন বিচিত্র কারণে পতন ঘটতে পারে। বিশ্ব ইতিহাসের সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকানোই এ সত্য মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে সাধারণত রাজস্ব ও অর্থনৈতিক চাপ প্রধান অথবা প্রাথমিক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

প্রায় দু'শতাব্দী ধরে অধিকাংশ স্থিতিশীল রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল স্বদেশের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অর্জন ও বজায় রাখা। বৈদেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ছিল অপশনাল। বাজেটের ৫% এর বেশি এর পেছনে ব্যয় করা হতো না। কিন্তু একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে প্রায় প্রাকৃতিকভাবে যে অর্থায়নের উদ্ভব ঘটে সেটার অবর্তমানে সাম্রাজ্যগুলো যেকোন মূল্যে লুটপাট অথবা মুনাফার জন্য বুভুক্ষু শিকারির মতো আচরণ করে। অ্যাটল্যানন্টিক দাস ব্যবসা, কঙ্গোতে বেলজিয়ামের রাবার লালসা, ব্রিটেনের ভারতীয় আফিম বাণিজ্য, তৃতীয় রাইখের হাতে ইউরোপের ধর্ষন অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা পূর্ব ইউরোপের শোষণ - এমন আচরণের জন্য সাম্রাজ্যবাদ কুখ্যাত।"

কিন্তু যখন রাজস্ব প্রবাহ শুকিয়ে আসে, কিংবা থেমে যায়, ম্যাকয়ের মতে - "অতিকায় সাম্রাজ্যগুলো ভঙ্গুর হয়ে পড়ে"। সাম্রাজ্যগুলোর ক্ষমতার বলয় এতোটাই দুর্বল যে, আসল বিপদ আসলে অভাবনীয় দ্রুততার সাথে তাদের পতন ঘটে।

পর্তুগালের সময় লেগেছিল মাত্র এক বছর, সোভিয়েত ইউনিয়নের লেগেছিল দু বছর, ফ্রান্সের আট বছর, অটোমানদের এগারো বছর, "গ্রেট ব্রিটেনের" সতেরো বছর, এবং খুব সম্ভবত অ্যামেরিকার জন্য সময়টা হল ২০০৩ এর ইরাক আক্রমণ থেকে শুরু করে ২৭ বছর।"[3]

ইতিহাস থেকে মোটমাট ৬৯টি সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানতে পাওয়া যায়। কোনটিই পতনের সময় যোগ্য নেতৃত্ব পায়নি। বরং এ পর্যায়ে ক্ষমতা গেছে রৌমান সম্রাট ক্যালিগুলা অথবা নিরোর মতো বিকৃত পশুদের কাছে। আমরা হয়তো এখন অ্যামেরিকায় বিকৃত, অসুস্থ বক্তৃতাবাজ নেতাদের কাছে শাসনকর্তৃত্ব যাবার এ প্রক্রিয়ারই বাস্তবায়ন দেখছি।

ম্যাকয়ের মতে - "অধিকাংশ অ্যামেরিকান ২০২০ এর দশককে মনে রাখবে - সেই একই বেতন দিয়ে হতাশাজনক, মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া, মূল্যস্ফীতির বাজারের মুখোমুখি হওয়া, আর ম্লান হতে থাকা আন্তর্জাতিক প্রভাবের জন্যে।"

বৈশ্বিক রিযার্ভ কারেন্সি হিসেবে ডলারকে যখন বাদ দেওয়া হবে, অ্যামেরিকার আর তখন ডলার ছাপানোর মাধ্যমে ঋণ ও বাজেট ঘাটতি মেটাতে পারবে না। খুব দ্রুত, খুব তীব্রভাবে অ্যামেরিকার ট্রেজারি বন্ডের অবমূল্যায়ন ঘটবে। আমদানির খরচ বেড়ে যাবে। বেকারত্বের বিস্ফোরণ ঘটবে। "অগুরুত্বপূর্ণ নানা ইস্যু নিয়ে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেবে। ফলে উত্থান ঘটবে

বিপদজনক কট্টর জাতীয়তাবাদের (hypernationalism) যা জন্ম দিতে পারে অ্যামেরিকান ফ্যাসিযমের।”

পতনের যুগেও প্যারানয়েড, বিচ্ছিন্ন, অপমানিত, নিন্দিত অভিজাতশ্রেণি প্রতিটি বাঁকে শত্রু আবিষ্কার করবে। পাইকারি নজরদারি, নাগরিক স্বাধীনতার ধ্বংস, নির্যাতনের সুক্ষাতিসুক্ষ পদ্ধতি, সামরিকায়িত পুলিশ, অতিকায় কারাগার, হাজার হাজার সামরিক ড্রোন আর স্যাটেলাইট - বৈশ্বিক কর্তৃত্বের জন্য গড়ে তোলা এসব যন্ত্রপাতি এবার ব্যবহার করা হবে স্বদেশে। সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়বে। অ্যামেরিকা নিজেই নিজেকে গ্রাস করবে। কর্পোরেট রাষ্ট্রের শাসকদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে না নিলে আমাদের জীবদ্দশাতেই তা ঘটবে।

* * *

লেখক - ক্রিস হেজেস

ক্রিস হেজেস একজন কলামিস্ট। পুলিতযার পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর। অ্যাক্টিভিস্ট, এবং একাধিক বেস্ট-সেলিং বইয়ের লেখক। এখনো পর্যন্ত তার লেখা ১১টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

মূল লেখার লিঙ্ক - [truthdig.com](truthdig.com)

---

[1] লেখকের এ পয়েন্টের সাথে দ্বিমত আছে। অন্যান্য আরো পয়েন্টেও আছে, তবে এ পয়েন্টটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইন শা আল্লাহ সুযোগ পেলে অন্য কোন লেখায় এটা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

[2] নিসন্দেহে অ্যামেরিকার এ “মারাত্মক স্ট্র্যাটিজিক ভুল” – এর ট্রিগার ছিল ৯/১১। এক অর্থে ৯/১১ অ্যামেরিকাকে এই স্ট্র্যাটিজিক ভুলের অর্ধেকের জন্য বাধ্য করেছিল।

[3] হেজেস এবং ম্যাকয়ের যুক্তি অনুযায়ীই, ২০০১ থেকে হিসেবে শুরু করাও খুব একটা অযৌক্তিক হবে না।